

ভুল মাপকাঠি

Asif Adnan

February 28, 2021

11 MIN READ

প্রত্যেক মানুষ স্রষ্টা, তাঁর একত্ব এবং নৈতিকতার ব্যাপারে এক সহজাত বোধ নিয়ে জন্মায়।^[1] আল্লাহর ব্যাপারে সচেতনতা, তাঁর জন্য ভালোবাসা এবং তাঁর আনুগত্যের প্রবণতা মানুষের মধ্যে কাজ করে জন্মগতভাবে। একইসাথে মানুষের মধ্যে কাজ করে সহজাত কিছু মূল্যবোধ। মানুষের এই সহজাত বোধকে বলা হয় ফিতরাহ। মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা রাসূলগণকে (আলাইহিমুস সালাম) এমন দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন যা এ ফিতরাহ বা সহজাত মূল্যবোধগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের শিক্ষা ও বিধানগুলো তাই সহজাতভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করে।

“অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দ্বীনের জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখো। আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির (ফিতরাহ) ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” (সূরা আর-রুম, ৩০)

একজন মুমিন ইসলামের বিধানগুলো মেনে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। সে জানে তাঁর ধর্ম তাঁকে সংকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করতে বলে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় আখিরাতে পুরস্কারের। একজন বিশ্বাসীর কাছে নৈতিকতা দিনবদলের সাথে বদলাতে থাকা আপেক্ষিকতার নাম না। নৈতিকতা তার কাছে আল্লাহর নির্ধারিত ভালো ও মন্দের অমোঘ শ্রেণিবিভাগ। ঈমানের দ্বারা সুদৃঢ় হওয়া ফিতরাহ মুমিনকে এ নৈতিকতা মেনে চলতে প্রভাবিত করে।

অন্যদিকে সেকুলারিয়ম নৈতিকতার এ দুটি ভিত্তিকে নষ্ট করে ফেলে। সেকুলারিয়মের যত ধারা আছে সবগুলোর জন্যই এ কথা প্রযোজ্য। তুলনামূলকভাবে নিরীহ যে ধারা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করতে চায় এবং আইন প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে ধর্মের এবং স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে, সেটার ক্ষেত্রে যেমন এ কথা সত্য, তেমনি আবার ধর্মবিরোধিতা ও ধর্মকে তাচ্ছিল্য করার সেকুলারিয়মের চরমপন্থী নাস্তিকতার ধারার ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

নৈতিকতার মাপকাঠিকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে সেকুলারিয়ম সেখানে বসায় মানবীয় খেয়ালখুশিকে। একটা সেকুলার রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক, ফ্যাশিস্ট, নাকি সমাজতান্ত্রিক, তাতে কিছু যায় আসে না। কাঠামো যা-ই হোক সেকুলারিয়ম নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে মানুষের খেয়ালখুশিকে, সেই খেয়ালখুশি হতে পারে একজন স্বৈরশাসকের, গুটিকয়েক নেতার অথবা সংখ্যাগুরু।

‘তুমি কি তাকে দেখোনি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে?’ (সূরা ফুরকান, ৪৩)

মানুষের খেয়ালখুশি এবং কামনা-বাসনা প্রায় প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে। এর কোনো স্থিতিশীলতা, তাল-লয়-মাত্রা নেই। তাই এগুলোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং আদর্শও বদলাতে থাকে ক্রমাগত। এক যুগের অসুস্থতা আরেক যুগের আবশ্যিকতা হয়ে দাঁড়ায়, এক সময়ের অন্যায় অন্য সময়ে পরিণত হয় বৈধ কিংবা প্রশংসনীয় কাজে। কোনো সমাজকে যখন মানুষের সহজাত নৈতিকতা এবং অন্তর্নিহিত ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় তখন দুটো ব্যাপার ঘটে।

অতি দ্রুত এবং অনিশ্চিত গতিতে ভালোমন্দের সংজ্ঞা বদলায়, এবং পর্যায়ক্রমে সমাজ এগিয়ে যায় নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের দিকে। আজকের পশ্চিমা সেকুলার সমাজে এ দুটো ব্যাপারই ঘটছে। আর সেকুলারায়নের সাথে সাথে ঘটতে শুরু করেছে আমাদের সমাজেও। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে জাহাঙ্গীর নগরের ছাত্রী হস্টেলের ট্রান্সে বন্দী আর ডাস্টবিনে পড়ে থাকা পলিথিনে প্যাঁচানো পরিত্যক্ত অপাপবিদ্ধ পরিত্যক্ত শিশুদের মৃতদেহ, পর্নোগ্রাফি আর মাদকের নেশায় আসক্ত লক্ষ লক্ষ শিশু-

কিশোর-যুবকদের অন্ধকারে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নীরব নিভৃত ধ্বংস, আর পাইকারী হারে ধর্ষিত, নির্যাতিত আর খুন হওয়া নারীদের মিছিল।

বিভিন্ন অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও ট্র্যাডিশানাল সমাজের মধ্যে একটা সহজাত শক্তি থাকে। এর কারণ হলো কিছু না কিছু সহজাত বৈশিষ্ট্য কিংবা ফিতরাতি মূল্যবোধ ট্র্যাডিশানাল সমাজের মানুষের মধ্যে টিকে থাকে। এ ছাড়া যেসব ফিতরাতি মূল্যবোধ তাদের খেয়ালখুশির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক না, নিজেদের ঐতিহ্য মনে করে সেগুলো আঁকড়ে থাকে বিভিন্ন ট্র্যাডিশানাল সমাজ। যেমন : সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, সতীত্বের মতো মূল্যবোধগুলো, বিয়ে, পরিবার, মা ও স্ত্রী হিসেবে নারীর ভূমিকা সব ধরনের সমাজে অত্যন্ত গুরুত্ব ও সম্মানের সাথে দেখা হয়। কারণ, এ বুঝগুলো মানুষের ফিতরাহর অংশ। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা মানুষের অন্তরে এগুলো গেঁথে দিয়েছেন।

কিন্তু একটা সমাজে সেকুলারিযমের প্রসারের সাথে সাথে কমতে থাকে এ ধরনের মানুষ ও মূল্যবোধ; কমতে থাকে সমাজে তাদের প্রভাবও। ধীরে ধীরে একপর্যায়ে পুরো সমাজ ওই অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে যা একসময় তারা সযত্নে লালন করত।

জাহেলি সভ্যতার এ ক্রমপরিবর্তনশীল, স্ববিরোধী চেহারার সবচেয়ে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হলো এখনকার পশ্চিমা সেকুলার সমাজগুলো। একদিকে এরা সংস্কৃতি এবং এর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধকে আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল মনে করে। অন্যদিকে নিজেদের ঠিক করা কিছু কিছু মূল্যবোধকে এরা সর্বজনীন ঘোষণা করে, এগুলোর লঙ্ঘন মারাত্মক অপরাধ মনে করে এবং লঙ্ঘনকারীকে কঠিন শাস্তি দেয়।

এ স্ববিরোধিতার উৎস হলো এমন দুটি মৌলিক নীতি যেগুলোকে আধুনিক গণতান্ত্রিক সেকুলার সমাজগুলো তাদের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

প্রথমটি হলো, সংখ্যাগুরু মতকে ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়টি হলো, ব্যক্তিস্বাধীনতা।

মজার ব্যাপার হলো, এ দুটি নীতি একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক। তৃতীয় কোনো মূলনীতির অধীনে এদের মধ্যে মিটমাট না করে দিলে এ দুটোর মধ্যে সংঘর্ষ অবধারিত।

সেকুলারিযম সহজাতভাবে ধর্মকে অস্বীকার করে। পাশাপাশি মানবজাতির জন্য কোনটা উপকারী আর কোনটা ক্ষতিকর সেটা ঠিক করার ক্ষেত্রে ফিতরাহকে (সহজাত মূল্যবোধ) গোনায়ে ধরে না। কোন আচরণগুলো বৈধ ও উপযুক্ত তা ঠিক করার মানদণ্ড হিসেবে সংখ্যাগুরু মত আর ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলনীতিকে গ্রহণ করার কোনো বিকল্পও তাই সেকুলার সমাজের থাকে না।

সেকুলার সমাজে এ দুটো নীতির বিভিন্ন বিকৃত ফলাফল সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন বিতর্কিত ইস্যু থেকে স্পষ্ট। যেমন : এসব সমাজে একদল মানুষ সমকামিতাকে মেনে নেয়ার কথা বলে। সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে এরা সমকামীদের সমান অধিকার চায়। গত কয়েক দশকে এরা এসব লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপকভাবে সফলও হয়েছে। তাদের এ দাবির ভিত্তি হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা তথা ব্যক্তি-অধিকারের মূলনীতি। ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি অনুযায়ী একজনের 'যৌনতা' নিয়ে আরেকজনের কথা বলার অধিকার নেই। অন্যদিকে গর্ভপাতের পক্ষেও ঠিক একই যুক্তি দেয় আরেকদল। এরা বলে, 'আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা আমার আছে। আমার শরীরের কী হবে, সেটা ঠিক করব আমি। এখানে অন্যদের কথা বলার কোনো অধিকার নেই।' এ কথার বিপরীতে বিরোধী পক্ষ কেবল এটুকুই বলতে পারে যে, এ ধরনের আচরণ সমাজের অধিকাংশ মানুষের মূল্যবোধের পরিপন্থী। যদিও বাস্তবতা হলো তাদের অনেকেই গর্ভপাতের বিরোধিতা করে নৈতিক ও ধর্মীয় জায়গা থেকে। কিন্তু সেকুলার সমাজের সেকুলার সদস্য হিসেবে সেটা তারা মুখ ফুটে বলতে পারে না। কারণ, সেকুলার সমাজ কখনো সেটা মেনে নেবে না। নৈতিকতা ও ধর্মের কোনো স্থান সেকুলার সমাজে নেই।

সংখ্যাগুরু মত আর ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার পর মূল্যবোধগুলোর নিত্য পরিবর্তনকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। একটি সমাজ কোন মূল্যবোধগুলো গ্রহণ করছে আর কোনগুলো বর্জন করছে, তাতে আসলে কিছু যায় আসে না। যেহেতু সবকিছু আপেক্ষিক তাই সবগুলোই সমানভাবে সঠিক। আজকের সেকুলার সমাজে যেসব আচরণকে জঘন্য মনে করা হচ্ছে, যেমন : ধর্ষণ কিংবা শিশুদের ওপর যৌন-নির্যাতন, এগুলোকে ঘৃণ্য অপরাধ মনে করার একমাত্র কারণ হলো এগুলোর ব্যাপারে মানুষের বর্তমান মনোভাব। কিন্তু এ মনোভাবে কালকে বদলে যেতে পারে। যেমন ব্যভিচার, বহুগামিতা ও সমকামিতার ব্যাপারে পশ্চিমের মনোভাব বদলেছে। একসময় সমকামিতাকে জঘন্য যৌনবিকৃতি আর অসুস্থতা মনে করা হতো, আর এখন সমকামীদের ‘বিয়ে’কে আইনি বৈধতা দেয়া হচ্ছে। আর এর বিরোধিতাকে বলা হচ্ছে ‘ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ’। মানুষের মনোভাব বদলানোর সাথে সাথে বদলে গেছে নৈতিকতা। একইভাবে মনোভাব বদলে গেলে আজকের অবৈধ কাজগুলোকে আর ঘৃণ্য অপরাধ মনে করা হবে না; বরং বৈধ কিংবা প্রশংসনীয়ও ভাবা হতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ভয়ংকর সব অপরাধও এক সময় পেতে পারে সামাজিক ও আইনি বৈধতা।

এসব নিয়ে প্রশ্ন করলে সেকুলাররা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়, কারণ ধর্ষণ কিংবা শিশুদের ওপর যৌন-নির্যাতনের মতো অপরাধগুলোর প্রতি তাদের মধ্যেও সহজাত ঘৃণা কাজ করে। কিন্তু এ ঘৃণার ভিত্তি সংখ্যাগুরু মত কিংবা ব্যক্তিস্বাধীনতা না; বরং সেকুলারিয়ার বিষ সত্ত্বেও এখনো তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকা আল্লাহপ্রদত্ত ওই সহজাত মূল্যবোধের ছিটেফোঁটা।

‘কেন তুমি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করো?’ ‘কেন তুমি সংখ্যাগুরু মতকে অন্য সব মূল্যবোধ ও আচরণের মাপকাঠি বানিয়েছ?’ এ প্রশ্নগুলো করলে একজন সেকুলারিস্ট হয়তো আরও বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। সে হয়তো বলবে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সে শ্রদ্ধা করে নিজের ব্যক্তিগত অনুরক্তি ও আদর্শিক অবস্থান থেকে। অথবা সে বলতে পারে, সে মনে করে গণতান্ত্রিক সেকুলার সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ।

কিন্তু আরেকজন যদি তার ব্যক্তিগত পছন্দ, আদর্শিক অবস্থান ও মতের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নেয়? সে ক্ষেত্রে সেকুলারিস্টের জবাব কী হবে? সবই যদি আপেক্ষিক হয়, তাহলে একজনের মত আরেকজনের ওপর প্রাধান্য পাবে না; দুজনের মত সমানভাবে সঠিক হতে বাধ্য। তাহলে দুটো বিপরীত সাংঘর্ষিক অবস্থার সুরাহা কীভাবে হবে? অধিকাংশের মত? অধিকাংশ কি সব সময় নৈতিক সিদ্ধান্ত নেবে? হিটলার কিংবা স্টালিনের গণহত্যার পেছনে কিন্তু অধিকাংশের সমর্থন ছিল। নড়বড়ে ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠার কারণে যা কিছু মূল্যবান মনে করে সেকুলার সমাজগুলো আজ আঁকড়ে ধরছে কালই হয়তো তারা অবস্থান নেবে সেটার বিরুদ্ধে। এ ছাড়া এ মূলনীতিগুলো দখলদারিত্ব ও উপনিবেশবাদের দিকে সেকুলার সমাজের অধঃপতনের পথ সুগম করে দেয়। কারণ, আগ্রাসন থেকে বিরত থাকার ভালো কোনো কারণ তাদের আদর্শ থেকে পাওয়া যায় না। একজন দাঁড়িয়ে বলবে, ‘অমুক দেশ আক্রমণ করলে আমাদের দেশ ও অর্থনীতির এই এই লাভ হবে।’ অন্যান্য নাগরিকরা এ কথা বিশ্বাস করে তার পক্ষে নেবে। যদি সংখ্যাগুরু তার পক্ষ নেয়, তাহলে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পরিণত হবে রাষ্ট্রীয় পলিসিতে। কিন্তু আদতে এর কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। এর পেছনে একমাত্র কারণ হলো লোভ। ইতিহাসের সব সীমালঙ্ঘনের পক্ষে বারবার এ যুক্তিই দেয়া হয়েছে। এ যুক্তিতেই এক পশু আরেক পশুকে আক্রমণ করে। ইউরোপিয়ান এবং অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সারা বিশ্বজুড়ে তারা লুটপাট চালিয়েছে এ ধরনের যুক্তির ওপর ভর করেই।

বাস্তবতা হলো, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংখ্যাগুরু মত সেকুলার সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি না। কারণ, স্বাধীনতার ফলাফল হলো সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা। কিন্তু স্বাধীনতা সিদ্ধান্ত নেয়ার মাপকাঠি না। অর্থাৎ কাউকে যদি সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা দেয়াও হয় তবুও সে কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে, সে প্রশ্ন থেকে যায়। তাই স্বাধীনতা থাকলেও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় একটি মাপকাঠির। একইভাবে সংখ্যাগুরু মতও কোনো মাপকাঠি হতে পারে না। সংখ্যাগুরু মত হলো বিভিন্ন ব্যক্তির নেয়া সিদ্ধান্তের সামষ্টিক ফল। কিন্তু এই ব্যক্তির কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? তাদের মাপকাঠি কী?

সেকুলার ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত নেয়ার মাপকাঠি হলো তাদের খেয়ালখুশি ও কামনা-বাসনা, যেগুলোকে তারা নিজেদের ইলাহ

হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ইসলামী শরীয়াহর সৌন্দর্য হলো শরীয়াহ মানুষের ফিতরাহ বা সহজাত প্রবণতার (Natural Disposition) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর খেয়ালখুশিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা সেক্যুলার ব্যবস্থা ফিতরাহর সাথে সাংঘর্ষিক। মানুষ ফেরেশতা না। প্রাণী হিসেবে মানুষ একই সাথে ধারণ করে অত্যন্ত মহৎ এবং অত্যন্ত পাশবিক আচরণের সক্ষমতা ও প্রবণতা। মানুষের পক্ষে সম্ভব না নিষ্পাপ হওয়া। সম্ভব না নিজের কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলা। মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির ভেতর উপযুক্ত মানসিক অবস্থা এবং তার চারপাশে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ প্রথমে ব্যক্তির মধ্যে এমন উপলব্ধি তৈরি করা যার কারণে ব্যক্তি নিজের ভেতর অনুভব করবে নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে দূরে থাকার, সেগুলোকে ঘৃণা ও বর্জন করার আকাঙ্ক্ষা। পাশাপাশি এমন একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যেখানে চাইলেও সীমালঙ্ঘন করা মানুষের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। হাতের নাগালে ঘিনা, অশ্লীলতা, নেশা, জালিয়াতি, বাটপারির সুযোগ রেখে তারপর মানুষ নিজে নিজে ভালো থাকবে, এই আশা করে লাভ নেই।

এ কাজগুলোতে জড়িয়ে যাবার পর ফিরে আসতে চেয়েও নিজের দুর্বলতার কারণে যে বারবার ব্যর্থ হয়, শরীয়াহ তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর প্রতি দুর্বলতা অনুভব করা ব্যক্তি যেন পা পিছলে এই খাদগুলোতে পড়ে না যায় সেটা নিশ্চিত করার জন্য শরীয়াহ তৈরি করে দেয় প্রয়োজনীয় সেইফটি লকগুলো। সবশেষে সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে শরীয়াহ জবাবদিহির ব্যবস্থা করে। নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য ব্যবস্থা করে নির্দিষ্ট শাস্তির। আর এ শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে গাফলতি, স্বজনপ্রীতি বা অযৌক্তিক শিথিলতার সুযোগ দেয় না।

এভাবে মানবজাতির আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ও সমাধান দেয় শরীয়াহ। শরীয়াহ মানুষের জন্য এমন একটি বাহ্যিক পরিবেশ এবং অভ্যন্তরীণ নৈতিকতার মানদণ্ড ঠিক করে দেয়, যা নিয়ন্ত্রণে রাখে মানুষের নফস এবং কুপ্রবৃত্তিকে।

আধুনিক সেক্যুলার পশ্চিম করে উল্টোটা। পদে পদে মানুষের ফিতরাহকে নষ্ট করে। উসকে দেয় মানুষের নফস ও কুপ্রবৃত্তিকে। বদলে দেয়ার চেষ্টা করে নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ভূমিকা ও পরিচয়কে। স্বাধীনতা ও অধিকারের নামে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযমকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, অপ্রয়োজনীয়, অসভ্য, অ-আধুনিক সাব্যস্ত করে। খেয়ালখুশি আর কামনা-বাসনাকে নৈতিকতার মাপকাঠি মেনে ভালোমন্দ ঠিক করে ইউটিলিটি বা উপযোগের ভিত্তিতে। এ সভ্যতা মূল্যবোধ মাপতে শেখায় ইন্দ্রিয়সুখ, সুবিধাবাদ আর বস্তুগত লাভ-ক্ষতির পাল্লায়। ভোগবাদ আর বস্তুবাদের ছকে পড়ে আপেক্ষিক হয়ে যায় সবকিছু। সেক্যুলার দর্শন আমাদের শেখায় নৈতিকতার কোনো পরম মানদণ্ড নেই, যা ইচ্ছে তা করার মাঝেই জীবনের সার্থকতা। ভোগ আর আনন্দই সব। আর ইচ্ছেমতো ভোগ করার সক্ষমতাই হলো স্বাধীনতা।

নৈতিকতার এ ভুল মাপকাঠির কারণেই আধুনিকতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরে থাকার পরও আজ পশ্চিমা সেক্যুলার সমাজগুলো থামাতে পারছে সমাজের অবক্ষয় আর ভাঙনের নীল স্রোত, পতনকালের অঙ্কুরিত অগ্ন্যুৎসব। মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারের ভাঙন, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, অবাধ ও বিকৃত যৌনতা, অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি, যৌনায়িত ম্যাস মিডিয়া, সমকামিতা, উভকামিতা, পশুকামিতা, শিশুকামিতা, নারী-পুরুষের সংজ্ঞাকে ঝাপসা করে দেয়া ট্রান্সজেন্ডার উন্মাদনা, বিনোদনে বুঁদ হয়ে থাকা থাকা সমাজ, নির্লিপ্ত ঔদাসীণ্য, ভোগবাদ আর অবিশ্বাসে নিমজ্জিত তারুণ্য-সভ্যতার বাঁধন ছিঁড়ে পড়ছে চারদিক থেকে। বাঁধাঙা গতিতে আধুনিক সভ্যতা ছুটে চলছে ধ্বংসপাহাড়ের কিনারায়, এক অনতিক্রম্য অন্তহীন অন্ধকারের দিকে-আদ, সামুদ্র, কওমে লুতসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নাম না জানা আরও অনেকে জনপদের মতো। মানুষিক খেয়ালখুশিকে দেবতার আসনে বসানো সেক্যুলারিযম এবং ভোগবাদের নেশাতুর নির্লিপ্ত কাচ-চোখে চেয়ে থাকা সেক্যুলার মানুষ এ পতন থামাতে অক্ষম।^[2]

~চিন্তাপরাধ বইয়ের প্রকাশিত

* * *

[1] প্রত্যেক শিশু ফিতরাতেৱ ওপর অর্থাৎ ঈমান ও সত্য-ন্যায়েৱ যোগ্যতা নিয়েই জন্মগ্রহণ কৱে। ঁরপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদী বানায় অথবা নাসরানী বানায় অথবা অগ্নিপূজারি বানায়।-সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৩৮৫

[2] মূল: Secularism & Moral Values, শাইখ জাফর ইদ্রিস। পরিবর্ধিত ও সম্পাদিত।